সংগ্রামে আন্দোলনে গৌরবগাঁথায়

শেখ হাসিনা

আমরা আজ স্বাধীন দেশের বাঙালি। বাঙালি হিসেবে আমরা আত্মপরিচয়ের সুযোগ পেয়েছি। আমাদের পাসপোর্ট আছে। আমরা পৃথিবীর সব জায়গায় যেতে পারি। কিন্তু এমন দিন আমাদের জীবনে আগে ছিল না। পাকিস্তান নামের যে একটি দেশ তৈরি হয়েছিল, তার ছিল দু'টি অংশ, একটি পূর্ব পাকিস্তান অন্যটি পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানে জনসংখ্যা বেশি ছিল। পশ্চিম পাকস্তানে কম। কিন্তু ঐ পশ্চিমারা দেশ শাসন করত। তাই পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা অর্থাৎ বাঙালির সংখ্যা বেশি থাকলেও উভয় অঞ্চলেই সমান জনসংখ্যা, এটাই মেনে নিতে বাধ্য ছিল বাঙালিরা। সে সময় বাঙালিদের অধিকার খর্ব করা হয়েছিল। তার কারণ পশ্চিমাদের সব সময় একটা ভয় ছিল যদি সম জনসংখ্যা না মানা হয়, আর এদিকে যদি অধিক জনসংখ্যা হয় তাহলে হয়ত বাঙালিরাই একদিন পাকিস্তানের ক্ষমতায় চলে যাবে বা ক্ষমতা পেয়ে যাবে। এজন্য প্যারেটি মানার জন্য চাপ দেয়া হয়েছিল এবং প্যারেটি মেনে বাঙালিদেরকে মাথা নিচু করে চলতে হত। পাকিস্তানিরা বাঙালিদের শুধু শাসনই করেনি নির্দয়ভাবে শোষণও করেছে।

জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে ধীরে ধীরে ঐক্যবদ্ধ করেন। বাঙালি জাতির শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্য সর্বপ্রথম আঘাত হানা হয় ভাষার ওপর। একটি জাতিকে যদি ধ্বংস করা হয় তাহলে তার সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য এবং ভাষাকে ধ্বংসের মধ্য দিয়েই তা করা হয়। বাংলা আমার মাতৃভাষা। সেই বাংলা ভাষাকে বাঙালিরা ব্যবহার করতে পারবে না। উর্দু একমাত্র উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এ ধরনের ঘোষণা দেবার সাথে সাথে তার বিরুদ্ধে সমগ্র বাঙালি সোচ্চার হয়। প্রতিবাদে শুরু হয় ছাত্র-জনতার আন্দোলন।

বঙ্গবন্ধু ১৯৫০ সালে গ্রেফতার হন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে গুলি হয়, সালাম-বরকত-জব্বারসহ অনেক শহীদ রক্ত দেয়। বঙ্গবন্ধু তখনো বন্দি। বন্দি থাকা অবস্থায়ও ছাত্রদের সাথে সব সময় তাঁর যোগাযোগ ছিল। তিনি যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য ছাত্র সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি বন্দি অবস্থায় হাঙ্গার স্ট্রাইক করেন প্রায় সতেরো দিন। ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়ে বাঙালি জাতি তার ভাষার মর্যাদা রক্ষা করে। নিজ ভাষার মাকে মা বলে ডাকার অধিকার অর্জন করে। বাঙালি জাতিই পৃথিবীর একমাত্র জাতি যাদের রক্ত দিয়ে ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ গরীব, অসহায় এবং দরিদ্র। অথচ আমাদের অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ, যে সম্পদ আমরা কখনও কাজে লাগাতে পারিনি। আমাদের সোনালি আঁশ পাট। পাট থেকেও অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সব ব্যয় হত পশ্চিম পাকিস্তানে। নতুন রাজধানী, শহরের পর নতুন শহর সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে মরুভূমির ওপর গড়ে তোলা হয়েছে। অথচ বাঙালিরা সব সময় অবহেলিত ছিল। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালির অধিকার আদায়ের দাবিতে এক আপোসহীন সংগ্রাম ছিল তাঁর।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়। হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী সকলে যৌথভাবে এই যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। এ সময় যে নির্বাচন হয় সে নির্বাচনের প্রতীক ছিল নৌকা। নির্বাচনে ২৩৭টি সিটের মধ্যে ২২৩টি সিট যুক্তফ্রন্ট লাভ করে এবং সরকার গঠন করে। সেই সরকার ছিল জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল সরকার। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকারকেও দেশ চালাতে দেয়া হয়নি। সরকার গঠনের মাত্র ১৪ দিনের মধ্যে ৯২(ক) ধারা জারি করে সেই সরকার ভেঙে দেয়া হয় এবং জাতির জনকসহ বহু নেতাকে তখন গ্রেফতার করা হয়। এরপর প্রায় দীর্ঘ ৬ মাস বঙ্গবন্ধু বন্দি ছিলেন। তারপর তিনি মুক্তি পান। ১৯৫৬ সালে আবার জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠন হয়। কিন্তু সেই সরকারকেও টিকতে দেয়া হয়নি। আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে, যখনই জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল কোনো সরকার গঠিত হয় তখনই সেই সরকারকে উৎখাত করার জন্য ষড়যন্ত্র করা হয়। আমরা দেখেছি ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগের সম্মেলন হয় কাগমারীতে। যদিও সেই সম্মেলনের কোন মতে জোড়াতালি দিয়ে আওয়ামী লীগের ভাঙন রোধ করার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায়, আওয়ামী লীগ ভেঙে যায়, মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ ছেড়ে চলে যান।

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের মার্শাল ল' জারি হয়। আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করে। ১১ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ, রাজনৈতিক নেতাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। বঙ্গবন্ধু ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে কারাগার থেকে মুক্তি পান হেভিয়াস করপাস করে। মুক্তি পাবার পর যেহেতু রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল তারপরও তিনি ছাত্রদেরকে সংগঠিত করেন এবং নিজে সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা আমাদের অনেক আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যেতেন। এই বেড়াতে যাওয়াটা ছিল অজুহাত। সংগঠনকে শক্তিশালী করা, গোপনে সংগঠনকে গড়ে তোলা আর বাঙালি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা, সচেতন করা-এটাই ছিল জাতির জনকের উদ্দেশ্য। তিনি সমগ্র বাংলাদেশ ঘুরে ঘুরে মানুষকে ধীরে ধীরে মার্শাল ল'য়ের বিরুদ্ধে-সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সচেতন করে সংগঠিত করে তোলার প্রয়াস চালান।

১৯৬২ সালের হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়। আরবী অথবা রোমান হরফে বাংলা লেখার কথা বলা হয়। আমি তখন আজিমপুর স্কুলে পড়তাম। বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ তখন প্রতিবাদে ফেটে পড়ে, শুরু হয় আন্দোলন। আইয়ুব খানের গভর্ণর ছিল মোনায়েম খান। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক কনভোকেশনে মোনায়েম খানের হাত থেকে কোনো ছাত্র ডিগ্রি নিতে রাজি ছিল না। তাকে সেখানে অপমান করে বের করে দেয়া হয়। ফলশ্রুতিতে শেখ ফজলুল হক মনি এবং ছাত্রনেতা আসমত আলী শিকদার- এই দু'জনের এমএ ডিগ্রি কেড়ে নেয়া হয় শাস্তি হিসেবে। কারণ ঐ আন্দোলনে আসমত আলী শিকদার এবং শেখ ফজলুল হক মনি ছিলেন ছাত্রলীগ নেতা। তারা সেই আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে তাদের এমএ ডিগ্রি কেড়ে নেয়া হয়। যদিও মনি ভাই সব সময়ই বলতেন, ডিগ্রি কেড়ে নিতে পারে কিন্তু বিদ্যাতো কেড়ে নিতে পারবে না। সেদিন ছাত্রদেরকে গ্রেফতার করা হয়, বন্দি করা হয়।

ছাত্র-সমাজ সব সময়ই প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। যেহেতু রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল সেহেতু এই ছাত্র সমাজই রাজনীতিতে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। আমরাও স্কুল থেকে মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় হাজির হতাম সেই প্রতিবাদ সভায় অংশগ্রহন করার জন্য।

বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয় ১৯৬২ সালে। আমার এখনও মনে আছে, আমি তখন ছোট্ট। সেদিন রাতে বেশ বৃষ্টি হচ্ছিল। ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়ির একতলায় মাত্র দুটো কামরা করে আমরা উঠেছিলাম তখন। হঠাৎ দেখি চারদিকে পুলিশ। কামাল আর আমি একই ঘরে। আমি কামালকে ডেকে তুললাম যে বাড়িতে পুলিশ, নিশ্চয়ই আব্বাকে গ্রেফতার করতে এসেছে। ঠিকই কিছুক্ষণ পর পুলিশ আব্বাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। দীর্ঘ ৬ মাস তিনি কারাগারে ছিলেন। এরপর আবার মুক্তি পান। প্রতিবারই আইনগত পদক্ষেপ নিয়ে তাঁর কারাগার থেকে মুক্তি পেতে হয়েছিল।

আইয়ুব খান কনভেনশন মুসলিম লীগ গঠন করেন। মিলিটারি ডিকটেটরদের যে চরিত্র- প্রথমে ক্ষমতা দখল তারপর দল গঠন। দল গঠনের মাধ্যমে দখলকৃত বৈধকরনের সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মার্শাল ল প্রত্যাহার করা হয়। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু এবং অন্য নেতারা মুক্তি পান। ১৯৬৪ সালে আবার বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। কারণ তারা জানত যে তিনি বসে থাকতে পারেন না। সকল রাজনৈতিক দলের সেই ৯ জন নেতার বিবৃতির কথা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে। সে সময় তিনিই সবাইকে সংগঠিত করেন। তিনি যখন এই মিলিটারি ডিকটেটরের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্রের পক্ষে সোচ্চার হতে চেষ্টা করেন তখন আবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের কথা আজকে যারা প্রবীণ তাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। এই যুদ্ধে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তান নামে যে অংশ সেই অংশে নিরাপত্তার কিছুই ছিল না। একটা যুদ্ধ করার মত কোনো শক্তি ছিল না। সে সময় বাঙালিদের সেনাবাহিনীতে নেয়া হত না, যারা বহু কষ্টে নিয়োগ পেত তাদের খুব হেয় চোখে দেখা হত। পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষার মত প্রতিরক্ষা খাতে কোনরকম ব্যবস্থা ছিল না। এই অভিজ্ঞতা থেকে জাতির জনক ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে যে সর্বদলীয় মিটিং হয়, সেই মিটিংয়ে ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। সেই ৬ দফা দাবিতে একদিকে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা খাতকে আরও শক্তিশালী করা, নেভাল হেড কোয়ার্টার, বাংলাদেশের জন্য পৃথক কারেন্সির ব্যবস্থা, বাংলাদেশকে সুরক্ষিত করা অর্থাৎ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সার্বিক আত্ম নিয়ন্ত্রের অধিকারের কথা বলা হয়। এই ৬ দফার অন্তর্নিহিত ভাষা পাকিস্তানি শাসকবর্গ কখনও পছন্দ করেনি। পছন্দ করেনি বলেই বঙ্গবন্ধু এই ৬ দফা নিয়ে যখন বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচারাভিযান চালাতে থাকেন তখন গ্রাম-গঞ্জ-শহরসহ প্রায় সব জেলায় গিয়েছেন। জনগণকে সচেতন করেছেন, ঐক্যবদ্ধ করেছেন। যশোরে গিয়েছেন, মিটিং করেছেন, সেদিনই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। ময়মনসিংহ গিয়েছেন মিটিং করতে সেখানে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। সিলেটে গেছেন মিটিং করতে সেখানেও তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জামিনে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। এমনিভাবে যেখানে তিনি মিটিং করতে যেতেন সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হত এবং তিনি জামিনে মুক্তি পেতেন। তারপর মে মাসের ৬, ৭, ৮ তারিখ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং চলে এই ৬ দফার ওপর। ৮মে বঙ্গবন্ধু নারায়ণগঞ্জে যখন জনসভা করে ফিরে আসেন, সেদিন রাতেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬৬ সালের ৮ মে গ্রেফতার করার পর তাঁর বিরুদ্ধে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে এই মামলা দেয়া হয়। ১৮ জানুয়ারি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধুকে গোপনে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে বন্দি করা হয়। আমার মনে আছে আমরা প্রতি ১৫ দিন পর অথবা স্পেশাল পারমিশন নিয়ে ৭ দিন পর জেল গেটে আব্বার সাথে দেখা করতে যেতাম। যথারীতি আমরা দেখা করতে যাই। ঘন্টার পর ঘন্টা জেল গেটে বসে থাকি। কিন্তু সেদিন আর আমাদের দেখা করতে দেয়া হল না। তখন আমরা জানি না কি অবস্থা। তিনি কি বেঁচে আছেন? কোথায় আছেন? তাঁকে কোথায় নিয়ে গেছে কিছুই আমরা জানতে পারিনি। এরপর দীর্ঘ ৬টি মাস আমরা কোনো খবর পাইনি, সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ জানতে পারেনি। ১৯৬৬ সালে তাঁকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ৭ জুন ঢাকাসহ সমগ্র বাংলাদেশে হরতাল পালন করা হয়। সেই হরতালে তেজগাওয়ের মনু মিয়াসহ আওয়ামী লীগ ও শ্রমিক লীগের বহু নেতা কর্মী আত্মাহুতি দেন। জাতির জনকের গ্রেফতারের প্রতিবাদে আন্দোলনে এগিয়ে চলে।

আমার বাবা যখন কারান্তরালে বন্দি থাকতেন, তাঁর অবর্তমানে আমার মা পরামর্শ, অর্থ সাহায্য করে আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালনা এবং কর্মীদের সংগঠিত করার কাজে পর্দার আড়ালে থেকে হাল ধরতেন। ৬ মাস পরে আগরতলা মামলা শুরু হয়। যেদিন মামলার জন্য স্পেশাল কোর্ট বসানো হয় ক্যান্টনমেন্টে। দীর্ঘদিন পর সেই প্রথম আমরা আব্বাকে দেখতে পাই কোর্টে গিয়ে এবং সেদিনই আমরা জানতে পারি যে, তিনি জীবিত আছেন।

আগরতলা মামলায় ৩৪ জন আসামির মধ্যে সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসার, সিএসপি অফিসার এবং অন্যান্য পেশার লোকদের জড়ানো হয়। এই মামলা চলাকালীন সময়ে আন্দোলনও অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশের মানুষ বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে এই মিথ্যা ষড়যন্ত্রমূলক মামলা কখনই মেনে নিতে পারেনি। এই আগরতলা মামলায় সবচাইতে বড় অভিযোগ ছিল যে, বঙ্গবন্ধু তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ষড়যন্ত্র করছেন।

এরপর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে ৬ দফাসহ ছাত্রদের ১১ দফা কর্মসূচি নিয়ে আমরা তখন ছাত্র সমাজকে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলি, সেখানে আমারও একটা ক্ষুদ্র দায়িত্ব ছিল। আগরতলা মামলা যখন চলতে থাকে তখন আমার দায়িত্ব ছিল যোগাযোগ করার, বাইরের খবর বঙ্গবন্ধুকে পৌঁছে দেয়া। সেখান থেকে তিনি যে নির্দেশ দিতেন সেই নির্দেশগুলো ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব আমি তখন পালন করি।

আন্দোলন আরও তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। আপনাদের হয়ত মনে আছে, এই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ ষড়যন্ত্র করে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই হত্যার পর গণঅভ্যুত্থান হয়, জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আন্দোলন তীব্র থেকে আরও কঠিন আকার ধারণ করে। এই আন্দোলনের এক পর্যায়ে আইয়ুব খান বাধ্য হয় তথাকথিত ষড়যন্ত্রমূলক আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করতে। তবে এর মাঝে আরও কিছু ঘটনা ঘটে। আগরতলা মামলায় বঙ্গবন্ধু এবং ৩৪ জন আসামীকে যে ফাঁসি দেবে সেটা প্রায় নিশ্চিত। এ সময় আইয়ুব খাব বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনা করতে চায় এবং প্যারোলে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিয়ে পাকিস্তানে নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে আলোচনা করার পক্ষে তখন অনেকেই ছিলেন। তবে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির জন্য চিরদিনই যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে সদা প্রস্তুত ছিলেন। ৩৪ জন আসামী, তাদেরকে বন্দিদশায় রেখে প্যারোলে মুক্তি নিয়ে তিনি যেতে কখনও রাজি ছিলেন না। যদিও আমাদের তখনকার দিনের অনেক বড় বড় নেতা এর পক্ষে ছিলেন। আমরা, আমাদের পরিবার এবং আমার মা এ ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ় ছিলেন। অনেক কথা আমাদের শুনতে হয়েছে। কোনো এক নেতার কাছ থেকে আমাকেও অনেক কথা শুনতে হয়েছে। আমাদের একজন বলেছিলেন, আমি তার নাম বলতে চাই না, নাম বলাটা সমীচীন হবে না, ইতিহাস কথা বলবে। প্লেন রেডি, অনেক নেতা চলে গেছেন ক্যান্টনমেন্টের যে মেসে আব্বাকে রাখা হয়েছে সেখানে। সেখান থেকেই তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে। আমার মা খবর পাবার সাথে সাথে আমাকে পাঠালেন যে, তুমি ঐখানে গিয়ে দাঁড়াও, যদি দেখা করতে পার। মা কিছু মেসেজ দিয়েছিলেন সেই মেসেজটা যেন পৌঁছে দেই। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ভেতরে যাবার আমার কোনো পারমিশন ছিল না। তবে আমাদের অনেক নেতা, অনেক বড় বড় আইনজীবী, অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিকে সেখানে আমি দেখেছি। আব্বাকে বুঝাচ্ছিলেন যে, গাড়িও রেডি, প্লেনও রেডি, গেলে কোনো ক্ষতি হবে না। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অনেক চেষ্টা করে আব্বার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেলাম। আব্বা বেরিয়ে এলেন। গেটের বাইরে আসা তাঁর সম্ভব নয়। তিনি গেটের ভেতরে আমি গেটের বাইরে। শুধু আমি মার ম্যাসজটা তাঁকে পৌঁছালাম। হাতে একটা চিঠিও ছিল কিন্তু চিঠি দেবার সুযোগ ছিল না। আব্বা বললেন, চিঠি দেবার দরকার নেই, কি ম্যাসেজ বলে যাও। আমি আব্বাকে বললাম, মা দেখা করার চেষ্টা করছেন। মার সাথে দেখা না করা পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমাদের সেই নেতারা বুঝলেন যে, আমার মা কখনই প্যারোলে যাবার পক্ষে ছিলেন না। আর আমার বাবাতো ছিলেনই না। তাই যারা চাচ্ছিলেন প্যারোলে নিতে তাদের প্রচেষ্টাটা ব্যর্থ হল।

আমি যখন ফিরে এলাম অনেকে আমার সাথে আমাদের বাড়িতে ফিরে এলেন এবং আমার মাকে দোষারোপ করলেন। তারা ভয় দেখাচ্ছিলেন যে, আপনি এত কঠিন, আপনি জানেন না যে ওনাকে ফাঁসি দেবে, ফাঁসি দিয়ে মেরে ফেলবে। আমার মা বলেছিলেন যে, বিধবা হলে তো আমিই হবো আর পিতা হারালে আমার সন্তানরা হারাবে। আপনারা ব্যস্ত হচ্ছে নেন? সারা বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে তিনি প্যারোলে যেতে পারেন না। এর পরে এল আমার ওপর আক্রমণ। আমাকে তারা বললেন, তুমি কেমন মেয়ে, তুমি চাও না তোমার বাবা ফিরে আসুক? আমি শুধু একটা কথাই বলেছিলাম যে, হ্যাঁ আমি চাই। আমার বাবা আমার বাবার মতো মাথা উঁচু করে ফিরে আসবেন। আমার বাবা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেটাই সঠিক সিদ্ধান্ত। আপনারা অযথা বাবাকে বিরক্ত করবেন না। আমি মাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেছিলাম। আমার মা আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন যে, কিছুই হবে না। তোমার বাব মাথা উঁচু করে ফিরে আসবেন।

আমাদের এভাবে অনেক ঘাতপ্রতিঘাত, অনেক চড়াই-উৎরাই পার হতে হয়েছে। আমার বাবা সেদিন সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে আইয়ুব খান বাধ্য হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং সর্বস্তরে ছাত্র-জনতার আন্দোলন গড়ে তুলে সেই আন্দোলন গণঅভ্যুত্থান রূপ লাভ করে। ফলশ্রুতিতে আইয়ুবের পতন ঘটে।
২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ তিনি মুক্তি পান। ২৪ ফেব্রুয়ারি তাঁকে ছাত্র-জনসভায় 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দখল করে মার্শাল ল জারি করে। মার্শাল ল জারি করার পরেও ইয়াহিয়া খান নির্বাচন দেয়। যেটা দীর্ঘ দিনের দাবি ছিল ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট, এক মানুষ এক ভোট। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ১৬৯টা সিটের মধ্যে ১৬৭টা সিট আওয়ামী লীগ পেয়েছিল। যদিও তখন আমাদের অনেক প্রগ্রেসিভ বন্ধুরা 'ভোটের আগে ভাত চাই' স্লোগান দিয়েছিল। আর বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে, নির্বাচনটা হোক, জনগণের ম্যান্ডেট নিই। জনগণের ম্যান্ডেটটা হাতে থাকলে পরে তখন কিভাবে বাংলাদেশ স্বাধীন করা যায় আমরা দেখব। কিন্তু আগে জনগণের ম্যান্ডেটটা আমরা নিয়ে নিই। কাজেই নির্বাচন হয়। আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। কিন্তু যেই মুহূর্তে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করল সেই মুহূর্তে পাকিস্তানী শাসকরা আর ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি নয়। জাতীয় সংসদ অধিবেশন একবার ডাকা হয়, বাতিল করা হয়, আবার ডাকা হয়, আবার বাতিল করে দেয়া হয়। পহেলা মার্চ ১৯৭১ সালে জাতীয় সংসদ অধিবেশন বাতিলের ঘোষণার কথা নিশ্চয়ই সকলের মনে আছে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে, আন্দোলনে শরিক হয়। গর্জে ওঠে 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে। ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সমস্ত সংসদ সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এবং বাংলাদেশের আত্মনিয়ন্ত্রের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়।
ইয়াহিয়া খান এবং ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে বাংলাদেশে আসেন আলোচনা করার জন্য। একটাই কথা ছিল ৬ দফা। বঙ্গবন্ধুর কথা ছিল যে, ৬ দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণীত হবে। আর তাদের কথা ছিল ৬ দফার কিছু ছাড় দিতে। ৬ দফা বাদ দিয়ে শাসনতন্ত্র হবে। এই আলোচনার এক পর্যায়ে ইয়াহিয়া খান ২৫ তারিখে সন্ধ্যায় বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যায়। পহেলা মার্চ ইয়াহিয়ার সংসদ স্থগিত ঘোষণার পরপরই প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তান সরকার হারিয়ে ফেলে। বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় বঙ্গবন্ধুর হাতে। ঐতিহাসিক ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এই ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্য দিয়েই বাঙালি জাতি কি চায়, সে কথা স্পষ্ট হয়ে যায়। মূলত স্বাধীনতার ঘোষণা এবং অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের কথা জাতির জনক তাঁর ভাষণের মধ্য দিয়ে সেদিন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলে দেন। প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার নির্দেশ দেন। একটা গেরিলা যুদ্ধের সার্বিক প্রস্তুতি নেবার নির্দেশনা ঐ ৭ মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে জাতিকে বঙ্গবন্ধু দিয়ে দেন। বাঙালি জাতি, তখন সকল শ্রেণী সকল পেশার মানুষ যে যেখানে আছে, সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রতিটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সকলকেই এই ভাষণের মধ্য দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক বঙ্গবন্ধু দিয়েছেন। মুক্তি সংগ্রামের এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি, গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি যে দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন সারা বাংলাদেশের মানুষ তা মেনে নেয়। শুধু মেনে নেয়া হয় সেই প্রস্তুতিও তারা গ্রহণ করে। মূলত ইয়াহিয়া খানের মার্শাল ল অর্ডার প্রতিদিন যা জাতির হতো বাংলাদেশের জন্য তা সম্পূর্ণ অকার্যকর ছিল। ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়ি থেকে যে নির্দেশনা বঙ্গবন্ধু পাঠাতেন, সেই নির্দেশনা অনুযায়ী গোটা বাংলাদেশের প্রশাসন চলতে শুরু করে। এমনকি কোনো ব্যাংকের টাকা পাকিস্তানে যেত না। সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ। সম্পূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন। ঐ সময়ে লন্ডনের একটা পত্রিকা ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সাথে তুলনা করেছে লন্ডনের ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের বাড়ির। ঐ বাড়ি যে ভূমিকা পালন করে ৩২ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধুর বাড়িও সেই ভূমিকাই পালন করছে। মূলত বাংলাদেশ তখন সম্পূর্ণভাবে আওয়ামী লীগ তথা বঙ্গবন্ধু পরিচালনা করেন।
২৫ মার্চ রাতে ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনী ঘুমন্ত বাঙালির ওপর আক্রমণ চালায় আমরা দেখেছি যুদ্ধের সময় বা এ ধরনের কোনো বিপ্লব যখন হয়, স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের জন্য তখন কতগুলো পদক্ষেপ নেয়া হয়। যারা আক্রমণকারী তারা সাধারণত আন্ত র্জাতিক সমর্থন পায় না। বঙ্গবন্ধু দেশের স্বাধীনতা চেয়েছেন কিন্তু কখনো আক্রমণকারী হিসেবে চিহ্নিত হতে চাননি। ঐ সময়টা ছিল মার্চ মাস। এটা একটা প্রচণ্ড স্নায়ুচাপের ব্যাপার। আমরা যখন আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়েছি তখন দেখেছি মুহূর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া কত কঠিন। তখন নানা জনে নানাভাবে কথাও বলে থাকে। কিন্তু ঐ সময় মাথা ঠিক রাখা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া একটা বিরাট ব্যাপার। রীতিমত ঝুঁকি নিতে হয়।
যেই মুহূর্তেই পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বাঙালির ওপর আক্রমণ চালায় সেই মুহূর্তে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ওয়ারলেস ঠিক করা ছিল। বর্তমানে যেমন বিডিআর, তখন ছিল ইপিআর। এছাড়া সমস্ত টেলিগ্রাম অফিস থেকে শুরু করে সব জায়গায় আগে থেকে একটা প্রস্তুতি নেয়া ছিল যে, বঙ্গবন্ধু সঙ্গে সঙ্গে যে ম্যাসেজ দেবেন সেই ম্যাসেজটা সারা বাংলাদেশে পৌঁছে দিতে হবে। সেই ম্যাসেজ নিশ্চয়ই সকলের মনে আছে, আমি এখানে সেটা তুলে ধরছি। বঙ্গবন্ধু যে ঘোষণাটি দিয়েছিলেন, 'This may be my last message, from today, Bangladesh is independent. I call upon th people of Bangaldesh whatever you might be and what ever you have to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last

soldier of the Pakistan occupation army is driven out of the soil of Bangladesh. Final Vistory is ours.’

ওয়ারলেসের মাধ্যমে এই ম্যাসেজ চলে যায় চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামে আমাদের আওয়ামী লীগের কর্মীদের কাছে কোথায় ম্যাসেজ যাবে তারাও সেই প্রস্তুতি নিয়েছিল। পাশাপাশি টেলিগ্রামের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে এই ম্যাসেজ ছড়িয়ে দেয়া হয়। এটা বাংলা অনুবাদ করা হয় এবং যে যেভাবে পেরেছে, কেউ হাতে লিখে (তখন তো আর ফ্যাক্স ছিল না, কম্পিউটার ছিল না, কমিউনিকেশন এত সহজ ছিল না) এই ম্যাসেজ সমগ্র বাংলাদেশের সব জায়গায় ছড়িয়ে দেয় এবং বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ স্বাধীন এই ঘোষণা দেন। এই ম্যাসেজ যাবার সাথে সাথে ৩২ নম্বর বাড়ি আক্রান্ত হয়। আর্মি বাড়ি আক্রমণ করে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে এবং গ্রেফতার করে প্রথমে ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে আদমজী স্কুলে নিয়ে যায়। সেখান থেকে বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে পাকিস্তানে নিয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর যারা সহযোগী, পূর্ব পরিকল্পনা এবং নির্দেশ অনুযায়ী তাদের করণীয় নির্ধারিত ছিল। কারণ ২৫ মার্চ তারা আক্রমণ করবে, বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করবে, এটা তিনি ভাবেননি, তিনি ভেবেছিলেন তাঁকে মেরেই ফেলবে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মত এমন একজন জনপ্রিয় নেতার পক্ষে দেশবাসীকে ছেড়ে কোথাও পালানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী এবং সকলে যাতে ঠিকমত তাদের শেল্টারে যেতে পারে এবং কি কি করণীয় সেই নির্দেশনা সেই পরিকল্পনা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। বিপ্লবী সরকারের বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিন আহমেদ প্রধনমন্ত্রী। এই বিপ্লবী সরকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ, অনেক ত্যাগ, রক্ত আর মা-বোনের সম্ভ্রমহানি এবং নির্যাতনের মাধ্যমে বাঙালিকে তারা ধ্বংস করতে চেয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার চেতনায় উত্তাল বাঙালিকে সেদিন রুখতে পারে এমন স্পর্ধা কারও ছিল না। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় বাঙালি তখন মরীয়া হয়ে উঠেছে। হয়ত জীবন নয়ত মরণ- তবু স্বাধীনতা, এটাই ছিল বাঙালির একমাত্র সিদ্ধান্ত। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান হানাদার বাহিনী আমাদের মিত্রশক্তি এবং মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়।

আমরা তখনও বন্দি ছিলাম। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ১৬ তারিখে আত্মসমর্পণ করলেও আমরা সেদিন ধানমন্ডি ১৮ নং রোডের একটি বাসায় বন্দি ছিলাম। ১৭ ডিসেম্বর আমরা বন্দিদশা থেকে মুক্ত হই।

কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা বা স্বাধীনতার সাধ অপূর্ণ থেকে যায়। কারণ তখনও জাতির জনক বন্দি। আমরা জানি না তিনি কোথায়। বিশ্বজনমত ও নেতৃবৃন্দের দাবিতে ৮ জানুয়ারি তিনি মুক্তি পান। ১০ জানুয়ারি তিনি লন্ডন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন। বঙ্গবন্ধু ফিরে আসার মধ্য দিয়েই বাঙালি জাতি বিজয়ের আনন্দ সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারে। আমরা জাতির জনককে ফিরে পাই। জাতির জনক দেশে ফিরে এসে সরকার গঠন করেন। বাঙালির হাজার বছরের স্বাধীনতার স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আজ সফল হল। যুগে যুগে বিদেশীরা এসে এদেশ শাসন করে ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, বাঙালির কর্মস্পৃহা, সংস্কৃতি ও প্রাণশক্তিকে দমন করে তাকে নিরীহ, অসহায় আর দরিদ্র করে রেখেছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দূরদর্শীপূর্ণ নেতৃত্ব বাঙালিকে তার স্বাধীন সত্তা প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ করে, সংগঠিত করে এবং এক সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করে। এটাই বাঙালির শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।